বই পড়ার স্মৃতি ঃ ৩৫ বছর পুরাতন একটি দিনলিপি

সরদার ফজলুল করিম

বাস্তব যখন মর্মান্তিকভাবে প্রতিকূল, তখন স্মৃতির মুকুরে অস্তিত্বের সন্ধান করার আর কি গত্যন্তর। যথার্থই পুরাতন। ১৯৭০ সালের একটি দিন-লিপির কথা বলছি।

...আগে পারা যেতো। কিন্তু ঢাকার রাস্তায় আজ আর নিরুদ্বেগে হাঁটা এবং নিজের মনে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবু যদি কখনো একটু খোলা জায়গার সাক্ষাৎ পাই, একটু নিরুদ্বেগে হাঁটার কিংবা নির্ঝঞ্ঝাটে বসার, তাহলে নিজের মনে স্মৃতিচারণ করতে আমার বেশ ভালো লাগে। আবার সেই স্মৃতিচারণকে যখন একটু আত্মবীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখতে চাই, তখন নিজেই অবাক হয়ে যাই। অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, বছরের হিসাবে বয়সের পরিমাণ কম না হলেও, কতো সামান্য সংখ্যক ঘটনার কথাই না এই স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। খুবই সামান্য। সেই ছোটকালে স্কুলে যাওয়ার দুএকটি দিনের কথা। মা-বাবার মুখ। কিশোর বয়সের প্রিয় সাথীদের কারুর নাম, বিস্মৃত নামের কোনো মুখ, অপর কারুর কণ্ঠের শব্দ। কিন্তু এরচেয়েও বিস্ময় জাগে, যখন দেখি, এই প্রিয়জনদের মুখের সঙ্গে, তাদের কোনো ব্যবহার বা ঘটনার সঙ্গে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভেসে ওঠে কয়েকখানি বইয়েরও স্মৃতি।

আর এই বইয়ের স্মৃতি প্রসঙ্গেই আমার মনে প্রশ্ন এসেছে ঃ আমরা যতো বই পড়ি তার কখানকে আমরা স্মরণ করতে পারি। স্কুল-কলেজের পাঠ থেকে পরবর্তী জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রেও যারা বইপুস্তকের সঙ্গে কম-বেশি জড়িত থাকি তারা হয়তো নিত্যনতুন বইয়ের নৈকট্যে আসি। পরিচয়ের সংখ্যা কারুর কম, কারুর বেশি হতে পারে। কিন্তু সঙ্গীহীন একাকিত্বে যখন আমরা নিজেরা নিজেদের মুখোমুখি হই, তখন কখানা বই আমাদের স্মৃতিরপটে ভাস্বর হয়ে ওঠে? আর যারা ওঠে, তারাই বা কি কারণে ওঠে? এ দুটিই আমার কাছে নিরতিশয় কৌতুকজনক প্রশ্ন বলে মনে হয়েছে। এ প্রশ্নের কোনো নিয়ম বা জবাব আমার নিজের স্মৃতি থেকেও পাইনি। আমি ঠিক জানিনে, কেন শরৎ বাবুর 'পথের দাবী' আমার মনে একটি প্রিয় সাথীর অবয়ব নিয়ে ভেসে ওঠে। শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য বইয়ে নাম যে আমি জানিনে, তা নয়। নাম হয়তো অন্য বড়ো সাহিত্যিকদের আরো কিছু বইয়ের জানি। তাঁদের সে সমস্ত বইয়ের কিছু আমি পড়েছিও। কিন্তু সে জানা জ্ঞানের কথা। আবেগের কথা নয়। তার কোনো বই পড়া ঘটনা হয়ে মনেরপটে দাগ কেটে বসেনি। যেমন রয়েছে 'পথের দাবী' পড়ার ঘটনা।

সে একটি রাতের কাহিনী। আমার কিশোরকালের কথা। কিন্তু কিশোরকালে আমি নিশ্চয়ই এই একখানি মাত্র বই পড়িনি। সন-তারিখের কথা মনে নেই। হতে পারে '৩৯ কিংবা '৪০। রাতটির কথা মনে আছে। আর মনে আছে কিশোর বন্ধু মোজাম্মেলের কথা। ও-ই আমাকে বইখানা দিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে। কিন্তু বইখানার কোনো নাম ছিল না। তার লেখকের কোনো হদিস ছিল না। নাম পৃষ্ঠাটি যত্ন করে কাটা ছিল। কেবল নাম পৃষ্ঠা নয়। প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় ডানে কিংবা বামে বইয়ের নামের যে পুনর্মুদ্রণ থাকে, সযত্নে তিনশ, সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার সেই জায়গাটুকুও কাটা ছিল। বন্ধু বলে দেওয়ার আবশ্যক করেনি যে, এ অতি নিষিদ্ধ দ্রব্য। বমাল ধরা পড়লে সেদিনই কয়েক বছর হয়ে যেতো। কিন্তু সে ধমকানিও নিশ্চয়ই সেদিনের কিশোর আমিকে নিরস্ত্র করতে পারতো না। সন্ধ্যার অন্ধকার না হতে পড়তে শুরু করেছি। ভারতী, সব্যসাচী আর ভারতীর সেই ভালো মানুষটির কথা, যার নাম এই মুহূর্তে আর মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, অপূর্ব। রঙ্গমঞ্চ ব্রহ্মদেশ। রেঙ্গুনের শহরতলিতে সব্যসাচী। তার আস্তানার সামনে 'পথের দাবী' বলে দুটি কথা লেখা আছে। দেশের স্বাধীনতার সে অগ্নিপুরুষ। ডান, বাঁ দুহাতে তার সমান চলে রিভলবার। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিন্দুমাত্র দুর্বলতারও ক্ষমা নেই। কিন্তু স্নেহাস্পদ কোমল ভারতী আর তার প্রেমাস্পদকে তিনি স্নেহ না করে পারেন না। সব্যসাচী আজ রেঙ্গুনে, তো কাল পোনাং-এ, তারপরে সিঙ্গাপুর বা জাকার্তায়। জাহাজ এসেছে কোত্থেকে। পুলিশের লোক অবতরণের সময় প্রতিটি যাত্রীকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে। সব্যসাচী এসেছে এই জাহাজে। তারা খবর পেয়েছে। কতো লোককে তারা আটকালো। কিন্ত সব্যসাচীর সন্ধান পেলো না। যাদের আটকালো তাদের মধ্যে হ্যাংলাপনা ময়লা কাপড় পরা এক গাঁজাখোরও ছিল। তার ট্যাঁকে পাওয়া গেলো গাঁজার কলকে। পুলিশ বললো ঃ তুমি গাঁজা খাও? সে অম্লানে বলে দিলো ঃ 'না হুজুর'। 'তবে এ কল্কি কেন? লোকটি নিঃসঙ্কোচে বলে ঃ 'যারা খায় তাদের জন্য আমি কল্কি বহন করি।' এই বলে সব্যসাচী বেরিয়ে এলো পুলিশের জাল ভেদ করে। গা শিরশির করা এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের কাহিনী। পরাধীন দেশের তরুণের মনকে উদ্বেল করে তোলে এমন সংলাপভরা কাহিনী।

'পথের দাবী'কে শরৎ সমালোচকগণ তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করেন না। লেখক নিজেও করতেন না। কিন্তু এ রচনার জন্য লেখকের একটি সস্নেহ আবেগের কথাও সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত। বয়সকালে, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনা পড়েছি, হয়তো একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু তার অন্য কোনো বই পড়া ঘটনা হিসেবে

এমন আবেগের সঙ্গে আমার মনের স্মৃতিতে বিজড়িত হয়নি, যেমন বিজড়িত হয়ে আছে 'পথের দাবী'। সেই যে সন্ধ্যায় পড়তে শুরু করেছিলাম তারপর কখন যে ঘণ্টা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে সকালের সূর্য আবার উঁকি দিয়েছিল, তা টের পাইনি। কিন্তু সেই রাতেই 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছিলাম। এমন একাগ্রতায় সে বয়স পর্যন্ত আর কোনো বই পড়িনি বলেই হয়তো 'পথের দাবী' পড়ার ঘটনা এমনিভাবে বিস্মরণের অতীত হয়ে আঁকা রয়েছে স্মৃতির পাতায়।

পার্ল বাকের 'গুডআর্থ' পড়ার ঘটনাটিও মনের পাতায় চোখ বুলালেই আমি দেখতে পাই। হয়তো তখন আইএ পড়ি। এখন যে দালানে ফজলুল হক হল, তখন সেটাই ছিল ঢাকা কলেজের হোস্টেল। আমি ঢাকা কলেজে পড়তাম। কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। হিন্দু, মুসলমান ছাত্র একই হোস্টেলে থাকতো। একদিকে হিন্দু ছাত্র, অপরদিকে মুসলমান ছাত্র। আমাদের হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ সাহেব। আজ আর তিনি নেই। শুনেছি, মারা গেছেন। তিনি বড়ো কড়া লোক ছিলেন। রাত ১০টার ঘণ্টা পড়লেই দারোয়ান তার হুকুম মতো মেইন সুইচ নিভিয়ে দিতো। ১০টা বাজতেই হোস্টেলের তিনদিকের তিনটি দালানই অন্ধকারে ডুবে যেতো। কেবল বাতি জ্বলত সিঁড়ির ওপর। তিনটা দালানের তিনটি সিঁড়িতে তিনটা বাতি। কেমন করে, জানিনে 'গুডআর্থ'খানা আমার হাতে এসেছিল। সন্ধ্যার সময় হয়তো পড়তে বসেছিলাম। ১০টার সময় ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তখন চীনের কৃষক পরিবারে। বাবা কৃষক। ক্ষেতে গরু নিয়ে হাল দিতে গেছে। ছেলেরা বাবাকে সাহায্য করছে। কিংবা হয়তো দেখছি, সমস্ত চীন জুড়ে দুর্ভিক্ষের করুণ ছায়া নেমেছে। খরার তাপে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চারদিকে 'এক মুঠো ভাত দাও' কান্না ছড়িয়ে পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ মরছে। তখনো বাংলাদেশে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ আসেনি। কিন্তু তবু পার্ল বাকের আঁকা এ ছবি একটি বাঙালি কিশোরের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়। কোনো চিত্রের আকর্ষণ নয়। নিরাভরণ ভাষার কি অদ্ভুত আর্কষণ। ইংরেজি বাইবেলের রীতিতে লেখা। তেমনি প্রাচীন ধরনের। সহজ শব্দের গাঁথুনি। সেই শব্দের তরীতে পাল তুলে আমি যেন আমারই অতিপরিচিত নদীর বুকে তরতর করে এগিয়ে চলেছি। কখনো দেখছি বাঁশের ভাড়ে দুখানা বোঝা ঝুলিয়ে কৃষক চলছে বাজারের পথে। কখনো বাক নিয়ে যাচ্ছে আবার জমিদার বাড়ির উপপত্নীদের অন্দর মহলে। ঘরের আলো নিভে যেতে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে একখানি চেয়ার পেতে বসলাম। যখন বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুললাম, তখন হোস্টেলের পূর্ব দালানটার ওপাশে রেল ইঞ্জিনের শেডের মাথায় সকাল বেলাকার সূর্যের লাল রঙ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। রাত্রি জাগরণের কোনো ক্লান্তিবোধ নেই। সকাল বেলাকার নির্মল হাওয়া আমার মনের আনন্দের সঙ্গে মিশে আমাকে যেন একটা নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে তুললো।

এমন স্মৃতি খুব বেশি নেই। যদি আরো থাকতো, আরো হতো, তাহলে তার সম্পদে নিজেকে আজ ধন্য মনে করতে পারতাম।

কেবল আর একখানি বই পড়ার কথা মনে হয়। কিন্তু সে কেবল নিজে পড়া নয় পাঁচজনকে নিয়ে পড়ার ঘটনা। সে এক কথকতার কাহিনী।

আমি তখন রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ। যে ওয়ার্ডে থাকি সেটার নম্বর হয়তো পাঁচ। এখন ভুলে গেছি। একটা লম্বা হলঘর। পাশে কম। দুটো লোহার চৌকি পাতলে মাঝখান দিয়ে এক ফালি হাঁটার পথ। রাতে এক ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ থাকতাম। হলের মধ্যে পঞ্চাশ, কি ষাটজন রাজবন্দীর বাস। মোটামুটি এই সংখ্যা। এর মধ্যে জেলের শাসন কখনো একে চালান করে দিচ্ছে রাজশাহী থেকে রংপুর। কখনো পাবনা থেকে আমদানি করে পুরে দিচ্ছে আর এক রাজবন্দীকে এই ওয়ার্ডে। কখনোবা বাছাই করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ডিগ্রি বন্ধ করে ফেলছে। তবু এর মধ্যে বন্দীরা একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলছে। নিজেরা কিচেন কমিটি বানিয়েছে। তাদের কাজ রান্নাবান্না করা। চালডালের হিসাব রাখা। টিনের থাল পিটিয়ে গোসল আর খাওয়ার সময় ঘোষণা করা। পেপার কমিটি বানিয়েছে। এর কাজ হচ্ছে, জেলের অফিস থেকে দেওয়া কয়েকখানি দৈনিক খবরের কাগজ এনে, যারা ইংরেজি কিংবা বাংলা জানে না তাদের পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া। সবকিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে, কর্মহীন একঘেয়েমির শ্বাসরুদ্ধকর বোঝা যেন কোনো বন্দীর বুক ভারী করে তুলে তার মনকে ভেঙে দিতে না পারে।

বন্দীদের মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত কর্মী। কমবেশি বাংলা, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। এরা বই পত্রিকা পড়ে নিজেদের জীবনের শূন্যতা ভরে রাখেন। কিন্তু বন্দীদের মধ্যে রয়েছে দিনাজপুর, রংপুরের কৃষক আন্দোলনের বেশ কিছুসংখ্যক কৃষক কর্মী ও নেতা। এদের মধ্যে যারা বয়স্ক তাদের কারোর বয়স পঞ্চাশ। কারোর পঞ্চান্ন। এরা লেখাপড়া তেমন জানেন না। কিন্তু চারদিকের পাঠের আবহাওয়ায় তাদের বৃদ্ধ বয়সেও শেখার ও পড়ার আগ্রহ শিশুর চেয়েও অদম্য।

এই সময়ে আমার হাতে এলো একখানা রাজনৈতিক ইংরেজি উপন্যাস। যুদ্ধের সময়কার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

ইংরেজ সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্কের পটভূমিকায় একজন অস্ট্রেলীয় সাংবাদিকের লেখা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই 'ডিপ্লোম্যাট'। স্ট্যালিন তখন সোভিয়েত রাশিয়ায় রহস্যময় পুরুষ। তার সঙ্গে সে দেশের কিংবা বিদেশের কোনো নেতা বা সাংবাদিকের সাক্ষাতের ঘটনা এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সেই রহস্য পুরুষকে ঘিরে এ উপন্যাসের কাহিনী।
আমি ঠিক করলাম, এ উপন্যাস আমি কৃষক কর্মীদের নিয়ে যৌথভাবে পড়বো। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে আমরা গোল হয়ে এই বই পড়তে বসতাম। আমি কয়েক লাইন ইংরেজি পড়তাম। তারপর সেই কয়েক লাইনের বাংলা অনুবাদ করতাম। আবার কিছুদূর ইংরেজি পড়তাম। আবার সেটুকুর বাংলা করতাম। আমার শ্রোতা কজন ছিল ঠিক মনে নেই। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে দুজনের মুখ এখনো আমি ভুলতে পারছিনে। একজন আভারাম সিং। আর একজন ডোমারাম সিং। দিনাজপুরের আদিবাসী কৃষক। দুজনার বয়সই ছিল পঞ্চাশের অধিক। নিজেদের বাড়িতে স্ত্রীপুত্র পরিজন রয়েছে। কিন্তু কখনো এদের মুখ ভার করতে দেখিনি। আমারই কখনো মন ভার হলে এরা এসে এদের গাঁয়ের ভাষায় বলতেন, 'কি ভাবছেন কমরেড, মন খারাপ কেনে করছেন?'
দুপুরে খাওয়ার পরে আমি একটু বিশ্রাম করতে চাইতাম। কিন্তু সেই 'ডিপ্লোম্যাট' শোনার তাদের আগ্রহ আমার নিজের সব পরিশ্রমের কথা ভুলিয়ে দিতো। খাওয়ার পরে মিনিট পনের বিশ্রামের পরেই তারা আমায় ডেকে তুলতেন, 'কেন আসেন না বাহে? আইসেন। শুরু করেন।'
এমনি করে রোজ চলতো 'ডিপ্লোম্যাটের' কথকতা। হাজার পৃষ্ঠার বই হাজার দিন না লাগলেও, পাঁচশ দিনের কাছাকাছি নিশ্চয়ই লেগেছিল। এতো দীর্ঘদিন ধরে কোনো বই আমি জীবনে পড়িনি। কিন্তু এই বৃদ্ধ সাথীদের আগ্রহের উষ্ণতায় কোনো বই পাঠে এতো আনন্দও কোনোদিন লাভ করিনি। কি করে যে পার হয়ে গেলো বন্দিত্বের এই পাঁচশ দিন, তা টের পাইনি। কেবল যে আমার শ্রোতারাই রোজ পাঠশেষে আগ্রহ করে অপেক্ষা করতেন পরের দিনটির পাঠ শুরু হওয়ার, তাই নয়। আমিও আগ্রহ করে অপেক্ষা করে থাকতাম এই মজলিশটির।
এখন আমরা বই পড়ি একা একা। কেউ কারুর মনের আনন্দের খোরাক অন্যকে দিইনে। আমরা বলিনে কাউকে ডেকে ঃ এই বইখানা পড়েছেন? এই দেখুন না এই জায়গাটিতে কেমন লিখেছে। কিন্তু একদিন ছিল যখন আমরা এমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন এক একটি আত্মদ্বীপে বিচ্ছিন্ন আর নির্বাসিত হয়ে যাইনি। একের মনের জ্ঞানের আনন্দ অপরকে না দিতে পারলে নিজেকে অতৃপ্ত মনে হতো।
আভারাম সিং আর ডোমারাম সিং-এর সঙ্গে 'ডিপ্লোম্যাট' বই পড়ে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম, বন্দীখানাতে, তার স্মৃতি তাই এক অমৃতের ভাণ্ডার হয়ে আজো আমার মনে ভেসে উঠে।